সম্পাদক আবদুস সালাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড

আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাভার

সম্পাদক আবদুস সালাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড

আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক আবদুস সালাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা
ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৭

আয়োজনে
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপদেষ্টা
অধ্যাপক মফিজুর রহমান
চেয়ারপারসন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

আহ্বায়ক
রোবায়েত ফেরদৌস

সদস্য
অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম
ফাহমিদুল হক
সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী
শাওন্তী হায়দার
আফরোজা বুলবুল

সম্পাদক
ফাহমিদুল হক

সহকারি সম্পাদক
মার্জিয়া রহমান

Editor Abdus Salam Memorial Trust Fund
University of Dhaka
Lifetime Achievement Award, Memorial Lecture and Student Scholarship Programme, 2017
Organized by Dept. of Mass Communication and Journalism, University of Dhaka, Dhaka 1000.

আজীবন সম্মাননা

শাহেদ কামাল

স্মারক বক্তা

অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান

স্মারক বক্তৃতা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তি: পাকিস্তান সমর্থক পত্রিকার ভূমিকা

অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান

এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা যে সময়কালের রাজনীতির সঙ্গে সাংবাদিকতার মিথস্ক্রিয়ার বিষয়ে আমাকে আলোচনা করার গুরুদায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন, সেটি ছিল অবিভক্ত বৃটিশশাসিত ভারতের এক দারুণ অনিশ্চয়তার কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন মাত্র শেষ হলেও, মানব ইতিহাসের ভয়ঙ্করতম ও নৃশংস সেই ঘটনার রেশ তখনও কাটেনি। যে সাম্রাজ্যে এক সময় সূর্য অস্ত যেত না, সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গ্রেট বৃটেন তখন যুদ্ধের পরিণামে মৃতপ্রায় দুর্বল সিংহের মতো ধুঁকছে। ভারতের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে বিরাজ করছে গুরুতর বিভ্রান্তি। বিশেষ করে, বৃটিশ শাসকরা তখন ভারত ত্যাগের ঘোষণা দেওয়ায় ভারতীয় রাজনীতির নতুন মেরুকরণ হচ্ছে। ভারতের প্রভাবশালী রাজনীতিকরা স্বাধীন ভারতের পরিচালক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল কংগ্রেসেরই এক প্রাক্তন নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ তখন পাকিস্তান নামে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র দাবি করছে। এই প্রশ্নে বৃটিশ শাসকরাও দ্বিধাগ্রস্ত। দ্বিধাগ্রস্ত কংগ্রেস এমনকি কম্যুনিস্টরাও। সেই সময়ে ভারতের সাংবাদিকতা ছিল দারুণভাবে রাজনীতিপ্রবণ। মূলত সংবাদপত্র প্রকাশিতই হতো রাজনৈতিক স্বার্থে। যে রাজনীতিকরা পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবি করেছিলেন তাঁদেরও প্রয়োজন ছিল কিছু সংবাদপত্রের। অবিভক্ত বাংলার প্রধান মুসলিম লীগ নেতারা তখন মূলত কলকাতাতেই সক্রিয়। কাজেই তাঁদের উদ্যোগে পাকিস্তান দাবির সমর্থক সংবাদপত্রগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল কলকাতায়। জিন্নার পাকিস্তান দাবি ছিল একটি নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িক দাবি। তিনি তাঁর দাবিকে কিছুটা অ্যাকাডেমিক প্রলেপ দিতে চেয়েছিলেন 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' নামক এক উদ্ভট চিন্তা উপস্থাপন করে। এই সময়ের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ছিল সম্ভবত সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। একদিকে বৃটিশ শাসক, অন্যদিকে দেশের বড় দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান

নেতারা বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতার এই ইন্ধন যোগানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা ছিল সংবাদপত্রগুলোর। আমরা এখানে মূলত অবিভক্ত বাংলায় পাকিস্তান দাবির সমর্থক সংবাদপত্রগুলোর সঙ্গে তৎকালীন মুসলিম লীগ রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া নিয়ে কিছু আলোচনা করব। এ সময়ের শেষ দিকে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল তার পূর্বাংশই এখন বাংলাদেশ। কাজেই আজকের স্বাধীন বাংলাদেশেও সেই সময়ের রাজনীতি ও সাংবাদিকতার মিথস্ক্রিয়ার বিষয়টি শ্রোতাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, এমন আশা কিংবা দুরাশা নিয়েই শুরু করছি।

চল্লিশের বিভাগপূর্ব সময়ে কলকাতার দৈনিক *ইত্তেহাদ* পত্রিকার জাঁদরেল সম্পাদক এবং প্রথম কাতারের মুসলিম লীগ নেতা আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁর লেখা *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* বইতে স্পষ্টই বলেছেন যে, ছেচল্লিশের কলকাতা মহাদাঙ্গা না হলে পাকিস্তান সৃষ্টি হতো না। তাঁর এই উক্তির তাৎপর্য ধরে অগ্রসর হলে বোঝা যায় যে, কলকাতা মহাদাঙ্গার পূর্বে পাকিস্তান দাবির সমর্থক লীগ নেতৃবৃন্দ এবং এই দাবির সমর্থক তৎকালীন সংবাদপত্রগুলোর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত বলে জোর প্রচারণার ভেতরটা ছিল নিতান্তই ফাঁপা। এমনকি জিন্না সাহেব, যাঁকে পাকিস্তানে পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা গণ্য করা হলো, তিনি নিজেও যে তাঁর দাবি অনুযায়ী পাকিস্তান পাবেন সে ব্যাপারে মোটেই নিশ্চিত ছিলেন না। মোহাম্মদ মোদাব্বের, যিনি সেই সময় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ-এর মালিকানাধীন এবং লীগের মুখপত্র বলে বিবেচিত *আজাদ* পত্রিকা এবং পরবর্তী সময়ে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রী না বলে প্রধানমন্ত্রীই বলা হতো) ও লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দীর মালিকানাধীন *ইত্তেহাদ* পত্রিকায় বার্তা সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন, তিনি তাঁর *সাংবাদিকের রোজনামচা* বইতে জানাচ্ছেন যে, জিন্না পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে 'বৃহত্তর' বা 'অখণ্ড' বাংলা রাষ্ট্রের গঠন প্রচেষ্টার প্রতি 'god speed' বলে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, জিন্না বিশ্বাস করতেন, কলকাতা ছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও তা হবে অর্থহীন। অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের গঠন প্রচেষ্টার প্রথম দিকে গান্ধীরও সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। এগুলো সবই ঐতিহাসিক সত্য। কাজেই জিন্না তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি এবং ইংরেজদের দরবারে নরম-গরম তদবির করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিশ্চিত করার যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তার সাফল্য সম্পর্কে তিনি নিজে এবং তাঁর অনুসারী লীগ নেতারাও মোটেই আস্থাবান ছিলেন না। তবে এটা ঠিক যে, তৎকালীন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের জিন্নাকে পাকিস্তান দিয়ে বা না দিয়ে ভারতকে 'স্বাধীনতা' দেওয়ার একটা তাড়া ছিল। কারণ বৃটিশ সরকার এই কাজটিই দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে ভারতে পাঠিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ধীরগতির ভাইসরয় ওয়াভেলকে তাই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সোহরাওয়ার্দী-শরৎ বসুর নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা গঠন প্রক্রিয়ার প্রতি এক পর্যায়ে লীগের মুখপত্র *আজাদ* পত্রিকা, এমনকি

খাজা নাজিমউদ্দিনসহ প্রায় সর্বস্তরের লীগ নেতাও সমর্থন জানিয়েছিলেন। মওলানা আকরম খাঁ অখণ্ড বৃহত্তর সার্বভৌম বাংলার পক্ষে *আজাদ*-এ সম্পাদকীয়ও লিখেছিলেন। আকরম খাঁ বরং মনে করতেন যে, বাংলা ও আসাম নিয়ে যে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে তার নাম হবে 'বঙ্গাসাম'।

এই অবস্থায় পাকিস্তান বাস্তবে রূপ নেবে কি নেবে না সে সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে অনিশ্চয়তা থাকা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষ্যযোগ্য যে, যখন নেতাদের মধ্যে এই অনিশ্চয়তা, তার আগেই কলকাতা মহাদাঙ্গা সংঘটিত হয়। মহাদাঙ্গার কারণে পাকিস্তানপন্থীদের এই কথা প্রচার করা সহজ হয় যে, এ দেশে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বাস করা সম্ভব নয়। তাদের অদ্ভূত যুক্তি ছিল এই যে, মহাদাঙ্গার ব্যাপকতাই তাদের বক্তব্যের অকাট্য প্রমাণ। তারা অবশ্য পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাঞ্জাবে যে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, তা উল্লেখ করে এ সত্য উচ্চারণ করেনি যে, পাকিস্তান হওয়ার কারণেই এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে পেরেছিল। কিংবা এ প্রশ্নও তারা তোলেনি যে, দাঙ্গার নামে অসহায় নিরীহ মানুষ মেরে কোনো রাজনৈতিক দাবি প্রতিষ্ঠার পথ কতটা অসঙ্গত, নিষ্ঠুর ও অনৈতিক।

যাই হোক, কলকাতায় দাঙ্গার নামে অসহায় কয়েক হাজার হিন্দু-মুসলমানের প্রাণনাশ করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার এই পরিবেশ সৃষ্টিতে কলকাতার পাকিস্তানপন্থী পত্রিকাগুলোর সবগুলোরই কম-বেশি ভূমিকা ছিল। আগে আমরা দেখে নিই যে, অবিভক্ত বাংলার প্রধান রাজনৈতিক ক্ষেত্র রাজধানী কলকাতায় তখন ক'টি পাকিস্তানপন্থী পত্রিকা ছিল? মোট পাঁচটি পত্রিকা মুসলিম লীগের রাজনীতি তথা পাকিস্তান দাবির সমর্থক ছিল। এগুলো হচ্ছে, মুসলিম লীগের আকরম খাঁ-খাজা নাজিমউদ্দিন গ্রুপের সমর্থক পত্রিকা *আজাদ*, মূলত অবাঙালি মুসলমানদের স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর *মর্নিং নিউজ*, ধনী ব্যবসায়ী ইস্পাহানীদের মালিকানাধীন মুসলিম ব্যবসায়ী গ্রুপের সমর্থক ও রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী *স্টার অফ ইন্ডিয়া*, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিমের নিয়ন্ত্রাণাধীন *মিল্লাত* এবং বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং বঙ্গীয় আইনসভায় লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা সোহরাওয়ার্দীর মালিকানাধীন *ইত্তেহাদ*। পত্রিকাগুলোর মধ্যে তৎকালীন মুসলিম লীগের উপদলীয় কোন্দলের প্রভাব ছিল প্রকট। *আজাদ* ছিল শতভাগ জিন্নাপন্থী। সেই সময় জিন্না ছিলেন ঘটনাক্রমে মুসলমানদের মধ্যে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয় নেতা। আকরম খাঁ–নাজিমউদ্দিন ছিলেন জিন্নাভক্ত উপদলের নেতা। ইস্পাহানীদের কাছে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ বড় হলেও লীগ রাজনীতিতে তারাও ছিল জিন্নার নেতৃত্বে বিশ্বাসী। উল্লেখ্য যে, ইস্পাহানী ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ। কলকাতাবাসী অবাঙালি মুসলমানরা ছিল একটি বিশাল সম্প্রদায়। এদের একটি অংশই কলকাতা দাঙ্গায় সবচাইতে সক্রিয় ছিল। খুন-খারাবিতে তাদের উৎসাহই ছিল সর্বাধিক। *মর্নিং নিউজ*

মূলত ছিল এদেরই মুখপত্র। এছাড়া পত্রিকাটির জিন্নাভক্তি তো ছিলই। তবে *মিল্লাত* এবং *ইত্তেহাদ* খানিকটা ব্যাতিক্রমী ছিল এই অর্থে যে, পাকিস্তান দাবির পক্ষে প্রকাশ্যে সোচ্চার থেকেও তারা এই অঞ্চলের মুসলমানদের বাঙালি চেতনাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে চাইত না। পাকিস্তান দাবির পক্ষে জিন্না যে উদ্ভট 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' হাজির করেছিলেন, তার পক্ষে এই পত্রিকা দু'টি তেমন সোচ্চার হয়নি। তবে *মিল্লাত*-এর বা তার মালিক আবুল হাশিমের তত্ত্ব ছিল এই যে, মুসলমানরা নির্যাতিত, তাই তারা প্রোলেতারিয়েত এবং সে জন্য তাদের আলাদা আবাসভূমি দরকার ইত্যাদি। *ইত্তেহাদ*-এ আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদক থাকায় তাতে প্রকাশিত লেখাগুলোর মান ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং যুক্তিনির্ভর। অন্যদিকে সুলেখক হলেও *আজাদ*-এর নীতি-নির্ধারণে সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের ভূমিকা ছিল নিতান্তই গৌণ। তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে সেই সময়ে আলোচ্য সবগুলো পত্রিকাই ছিল কম-বেশি সোচ্চার। এই পাকিস্তান কেমন হবে, রাষ্ট্র হিসেবে তার গঠনপ্রণালী কী হবে – এই সব আলোচনা *মিল্লাত* কিংবা *ইত্তেহাদ*-এ কিছুটা হয়েছে; কিন্তু *আজাদ*-এর স্পষ্ট কথা ছিল, আগে কোনো তর্কে না গিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারপর প্রয়োজনবোধে এইসব আলোচনা।

কিন্তু *আজাদ*-এর পৃষ্ঠায় পাকিস্তান কেমন রাষ্ট্র হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে অনীহা জানিয়েও এমন সব সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে, যাতে এ ক্ষেত্রে *আজাদ*-এর মনোভাব অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। যেমন ভবিষ্যৎ পাকিস্তান কেমন রাষ্ট্র হবে সে প্রসঙ্গে ১৯৪৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে *আজাদ*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য: '...পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দেশ হইলে, সে গণতন্ত্রের রূপ ও পরিচয় কি হইবে – তাহা বৃটিশ গণতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করিবে, না মার্কিন গণতন্ত্রের অনুসারী হইবে, না অন্যকিছু? পাকিস্তান পুঁজিবাদ স্বীকার করিবে, না, নিছক সমাজতান্ত্রিক আদর্শই হইবে তার পরিণতি?'

অর্থাৎ 'গণতান্ত্রিক' না হয়ে যদি পাকিস্তান 'নিছক সমাজতান্ত্রিক পরিণতি'-এর দিকে যায় তবে *আজাদ* তাকে ভালো মনে করবে না। কারণ 'সমাজতন্ত্র' হচ্ছে একটা 'নিছক পরিণতি' যা স্পষ্টতই নেতিবাচক। আর পুঁজিবাদ হচ্ছে সেই সময়ে শুধু 'স্বীকার' করে নেওয়ার মতো একটি ব্যবস্থা।

এখানে উল্লেখ্য যে, কামরুদ্দিন আহমদ *A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh* নামক বইতে মুসলিম লীগের ভেতরেও 'বামপন্থী' এবং 'ডানপন্থী' ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। সার্বিকভাবে মুসলিম লীগের এই প্রবণতাগুলো পাকিস্তানপন্থী আলোচ্য সংবাদপত্রগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছিল। *আজাদ* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে স্পষ্টই বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের 'মূলনীতি' মেনে নেওয়ার পরই পাকিস্তান রাষ্ট্র কী ধরনের হবে, সেটি সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে, তা-ও হতে হবে কেবলমাত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর। তবে এই 'মূলনীতি' বিষয়টি ঠিক কী, তা

আজাদ-এর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল না। *আজাদ*-এর অবশ্য দাবি বা আবদার ছিল যে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতের সবাইকে পাকিস্তানের এই তথাকথিত 'মূলনীতি' মেনে নিতে হবে।

আজাদ-এর বক্তব্যে বোঝা যায় যে, *আজাদ* চাচ্ছিল বিনা বাক্য ব্যয়ে পাকিস্তান দাবি মেনে নেওয়া হোক। অর্থাৎ পাকিস্তান দাবি যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক সে বিচারে যাওয়া যাবে না। ভাবটা যেন এই যে, প্রথমে পাকিস্তান দাবির পক্ষে 'ঈমান' আনতে হবে, তারপর অন্য কথা! কিন্তু সেই সময়ে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ নিজেরাই যে কলকাতাকে অন্তর্ভুক্ত রেখে বাংলা ও আসাম নিয়ে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র কিংবা প্রাদেশিক লীগ সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ-এর ভাষায় স্বাধীন 'বঙ্গাসাম' রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করেছিলেন, সে কথা কিন্তু পাকিস্তান দাবি প্রসঙ্গে *আজাদ* মাঝে মাঝে সুবিধামতো বিস্মৃত হতে চেয়েছিল। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে, জিন্নার ইচ্ছা অনুযায়ী কলকাতা অন্তর্ভুক্ত রেখেই স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে বরং কলকাতার তুলনায় অনুন্নত জেলা শহর ঢাকাকে রাজধানী করে পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ প্রদেশ গঠনের ক্ষেত্রে ঢাকার নওয়াব পরিবারের আগ্রহ প্রকাশ পায়। সোহরাওয়ার্দীকে পরাজিত করে খাজা নাজিমউদ্দিন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর কলকাতাসহ বাংলা স্বাধীন করার দাবি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু এই খাজা নাজিমউদ্দিনই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস আগে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে স্বাধীন অখণ্ড বাংলার পক্ষে জোর সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। খাজা নাজিমউদ্দিন এবং আকরম খাঁ-ও তাঁর স্বাধীন 'বঙ্গাসাম' রাষ্ট্র গঠনের বা কলকাতাকে রেখে বাংলায় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে আর উচ্চবাচ্য করেননি। ঘটনাপ্রবাহের এই অসঙ্গতি কিন্তু তৎকালীন ইতিহাসে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসেবেই রয়ে গেছে।

আবুল মনসুর আহমদ আমাদের জানাচ্ছেন যে, ৫ আগস্ট (১৯৪৭) তারিখে খাজা নাজিমউদ্দিন পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানপন্থী পত্রিকাগুলোর মধ্যে কেবল *ইত্তেহাদ* ছাড়া অন্যান্য পত্রিকায় কলকাতাকে অন্তর্ভুক্ত রেখে বাংলা স্বাধীন করার দাবি মন্দীভূত হয়ে যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগের কয়েক বছরের পাকিস্তানপন্থী কলকাতার পত্রিকাগুলোর উপস্থাপনা ও মতামত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্রগুলোর নিকট পাকিস্তান দাবিটি কোনো আদর্শভিত্তিক দাবি ছিল না, বরং যেকোনো প্রকারেই হোক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ রেখে ক্ষমতায় থাকাই ছিল এই দাবির অন্তর্গত অভিপ্রায়। এ ক্ষেত্রে জিন্না উদ্ভাবিত তথাকথিত 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব'-এরও কোনো প্রভাব ছিল না। এই তত্ত্বটি সম্পর্কে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও পত্রিকাগুলোর পাতায় দৃষ্টিগোচর হয়নি।

এ সময় এ পত্রিকাগুলোতে শুধু যে পাকিস্তান দাবির বিরোধিতাকারীদের বিশেষ করে

কংগ্রেসের সমালোচনা করা হয়, তা-ই নয়, তাদের ভাষায় 'জাতীয়তাবাদী মুসলমান'দের (অর্থাৎ লীগবিরোধী মুসলমান) কঠোর নিন্দার পাশাপাশি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং তাদের প্রতিনিধিত্বের অধিকারকেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, পত্রিকাগুলো তৎকালীন বাঙালি মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যথা, শেরে বাংলা ফজলুল হক, নওশের আলী, শামসুদ্দীন আহমদসহ অন্যান্য লীগ-বিরোধী মুসলিম নেতৃবৃন্দের তীব্র, অশালীন ও প্রায়শ অযৌক্তিক নিন্দা-সমালোচনায় মুখর হয়।

উল্লেখ্য যে, এই সময় ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত অবস্থায় ছিলেন। প্রধানত জিন্নার সঙ্গে মতবিরোধের কারণেই ফজলুল হককে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ফজলুল হক পুনরায় মুসলিম লীগে যোগদান করলে সানন্দে তাঁকে দলে স্বাগত জানায় *আজাদ* পত্রিকা এবং তাঁর নেতৃত্বগুণের ভূয়সী প্রশংসা করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলিম লীগের রাজনীতির চাইতে পত্রিকাগুলোর মধ্যে *আজাদ* ও *স্টার অব ইন্ডিয়া*-য় ব্যক্তি জিন্নার প্রতি আনুগত্য বেশি ছিল। এই দু'টি পত্রিকার মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য মিল এই যে, সুভাষ বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতি উভয় পত্রিকার বিরূপতা ছিল। তারা এই বাহিনীর সদস্যদের দেশপ্রেমিক মনে করত না।

স্টার অব ইন্ডিয়া রাজনীতিতে বিপ্লবী তৎপরতার বিরোধী এবং বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতায় বিশ্বাসী ছিল। অন্যদিকে *মিল্লাত* পত্রিকা ছিল বৃটিশবিরোধী। আজাদ হিন্দ বাহিনীর ক্যাপ্টেন রশীদকে (১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে) দণ্ডাদেশ দেওয়া হলে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ বিক্ষোভের পরিণামে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটি মিলন প্রচেষ্টা চলতে পারে, এই 'আশঙ্কায়' *আজাদ* বিচলিত হয়েছিল। অন্যদিকে *মিল্লাত* এই বিক্ষোভকে স্বাগত জানিয়েছিল।

মিল্লাত ও *আজাদ* পত্রিকার ভূমিকার তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে, উভয় পত্রিকা ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী প্রচারে মুসলিম লীগের কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জানালেও *আজাদ* এই প্রচারণায় ছিল বিশেষভাবে কম্যুনিস্ট ভাবধারার বিরোধী, অন্যদিকে *মিল্লাত* এই প্রচারণায় মুসলমানদের শোষিত হিসেবে চিত্রিত করে কিছুটা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে এই নির্বাচনকে শোষক-শোষিতের লড়াই বলে চিহ্নিত করে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের সমর্থন করেছিল।

১৯৪৬-এর নির্বাচনে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থায় নির্বাচিত হয়েও মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী অবশ্য কোয়ালিশনে কংগ্রেসকে রাজী করাতে ব্যর্থ হন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর এই কোয়ালিশন প্রচেষ্টার ব্যাপারে *আজাদ* সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির

কারণে সর্ব অবস্থায় কোয়ালিশনের বিরোধী ছিল। কিন্তু *স্টার অব ইন্ডিয়া*-র মালিক যেহেতু ছিলেন ব্যবসায়ী ইস্পাহানীরা, কাজেই তারা বিশৃঙ্খলতার রাজনীতির চাইতে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাদের ব্যবসায়ের সুবিধা হবে ভেবে শর্ত সাপেক্ষে কোয়ালিশনের পক্ষে ছিল, ফলে তাদের পত্রিকাটিও একই নীতির অনুসরণ করে। দেখা যায় যে, *স্টার অব ইন্ডিয়া* কোয়ালিশন প্রশ্নে ছিল বেশ নমনীয়।

সোহরাওয়ার্দী কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনে ব্যর্থ হয়ে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। *আজাদ* ব্যক্তি সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু তৎকালীন উপদলীয় কোন্দলে *মিল্লাত*-এর পরিচালক আবুল হাশিম ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর মিত্র। তাই সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভার প্রতি *মিল্লাত*-এর মনোভাব ছিল অনুকূল।

তবে এই পর্যায়ে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, উপদলীয় কোন্দলে জড়িত পাকিস্তানপন্থী ও লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সর্বদা একই নীতি বজায় রেখে চলতে পারেনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে পত্রিকাগুলোতে গুরুতর বিভ্রান্তি দেখা দেয়ায় এ সমস্ত পত্রিকার ভূমিকা মাঝে মাঝে স্ববিরোধী হয়ে ওঠে। স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠন প্রশ্নে পত্রিকাগুলোর মধ্যে স্ববিরোধী প্রবণতা মাঝে মাঝেই প্রকট হয়ে ওঠে। তারা নিজেরাও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে বিভ্রান্তিতে ভোগে। পত্রিকার পাতায় এই বিভ্রান্তিগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র গঠন, স্বাধীন বাংলায় কলকাতাকে অন্তর্ভুক্ত রাখা কিংবা পাকিস্তান রাষ্ট্রে কলকাতার অন্তর্ভুক্তি, বাংলা ও আসামকে একত্রিত করে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন ইত্যাদি প্রশ্নে পত্রিকাগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ উপদলীয় কোন্দলকে কেন্দ্র করে নানা বিভ্রান্তির প্রকাশ দেখা যায়। পাকিস্তান দাবি ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মেনে নেবে কি না, মানলেও কতখানি মানবে, এই প্রশ্নে কংগ্রেস ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে কী মাত্রায় প্রভাবিত করতে পারবে, এসব প্রশ্নে মুসলিম নেতারা মোটেও নিশ্চিত ছিলেন না। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত যে ধরনের পাকিস্তান মুসলিম লীগ নেতাদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, সে পাকিস্তান সম্পর্কে লীগের শীর্ষ নেতা জিন্না নিজেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, তাঁর ভাষায়, 'পোকায় খাওয়া, খণ্ডিত পাকিস্তান' পেয়েছেন। এ অবস্থায় পাকিস্তান দাবি কিংবা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতা কিংবা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন পত্রিকাগুলোর গুরুতর বিভ্রান্তি বা স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক। বাস্তবেও তাই ঘটেছিল।

এই সমস্ত বিভ্রান্তির একটা প্রধান কারণ ছিল সম্ভবত এই যে, ১৯৪৬ সালের কলকাতা মহাদাঙ্গার পর বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তার কিছু দিনের মধ্যেই সকল বাঙালিকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হালে পানি পায়নি, যদিও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ করে মুসলিম লীগ দলে সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের পক্ষে শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায়দের এই উদ্যোগের

ব্যাপারে প্রথমে যথেষ্ট সক্রিয় দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ততদিনে কংগ্রেসপন্থী সংবাদপত্রগুলোর চোখে সোহরাওয়ার্দী 'দাঙ্গাবাজ' হিসেবে পরিচিত হয়েছেন এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পরিণামে স্বয়ং গান্ধী কর্তৃক অখণ্ড স্বাধীন বাংলার উদ্যোগ বন্ধ করার নির্দেশ পেয়েছিলেন শরৎ বসু। অনেকে অবশ্য এই উদ্যোগ বন্ধের পেছনে নেহেরু ও প্যাটেলের বিরোধিতাকেও দায়ী করেন। উল্লেখ্য যে, গান্ধীর উপর নেহেরু-প্যাটেলের চাপ সৃষ্টির ক্ষমতা এখন ইতিহাস-স্বীকৃত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এইসব ধারণা সৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ তৎকালীন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলোর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মতাশ্রয়ী সংবাদ, সম্পাদকীয় এবং বিভিন্ন নামে-বেনামে লেখা বহু সংখ্যক প্রবন্ধ-নিবন্ধ। এমনকি বাংলা ভাগ প্রসঙ্গে তখন পত্র-পত্রিকায় এই উদ্যোগের পক্ষে-বিপক্ষে বেশ কিছু সংখ্যক ছড়া, কবিতা এমনকি গান ছাপা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, এ প্রসঙ্গে খুকুর তেলের শিশি ভাঙ্গা নিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিখ্যাত 'রাজনৈতিক' ছড়াটির কথা বলা যায়, যেটি এখনও অনেকেরই স্মৃতিতে ধারণ করা আছে।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির সমর্থনে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' বা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালন করে। এই দিবসটির প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঠিক কার বিরুদ্ধে – ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে নাকি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তা মুসলিম লীগের অধিকাংশ নেতাই সম্পূর্ণ স্পষ্ট করেননি। আবুল মনসুরের মতে, খাজা নাজিমউদ্দিন বলেছিলেন যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে।

তৎকালীন পাকিস্তানপন্থী পত্রিকাগুলোর পৃষ্ঠায় আসন্ন 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' সংক্রান্ত সম্পাদকীয় ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের এই দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে লিয়াকত আলী খান ও খাজা নাজিমউদ্দিন এবং পত্রিকাগুলোর মধ্যে মূলত *আজাদ* পত্রিকার কণ্ঠস্বরই অধিক 'জঙ্গি' মনোভাবসম্পন্ন ছিল।

এই অবস্থায় দেখা যায়, ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু নেতার এই দিবস সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তৃতা ও কার্যকলাপ দাঙ্গা বাধানোর ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। কোনো কোনো লেখকের মতে বৃটিশ সরকারই কৌশলে এই দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল। *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম* নামক পুস্তকে সুপ্রকাশ রায় লেখেন, 'ভারতের কতিপয় মুসলমান ও হিন্দু নেতার দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি ও ক্রিয়াকলাপ যে উগ্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়াই বৃটিশ শাসকগণ এই দাঙ্গা (অর্থাৎ কলকাতা মহাদাঙ্গা) বাধাইতে পারিয়াছিল।' *বাংলাদেশের ইতিহাস* বইতে ইতিহাসবিদ এম.বি.এস মাহমুদের বক্তব্য: কলকাতা দাঙ্গার জন্য 'পত্র-পত্রিকার প্রচারণা, নেতৃবৃন্দের উস্কানীমূলক বক্তৃতা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখা দায়ী ছিল।'

কলকাতার মহাদাঙ্গার পর ১৯৪৭ সালে দাঙ্গার ক্ষত না শুকাতেই লীগ ও কংগ্রেস

নেতৃবৃন্দ যথা সোহারাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখের স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি *আজাদ* ও *স্টার অব ইন্ডিয়া* স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের বিরোধিতা করে। *মিল্লাত* অবশ্য মনে করত যে, অখণ্ড স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই পাকিস্তানের বাস্তবায়ন হবে। কিন্তু অন্যদিকে *আজাদ* অখণ্ড বাংলাকে পাকিস্তানে আনা সম্ভব নয় মনে করেও 'পূর্ব পাকিস্তানে সকল সম্প্রদায়ের স্বাধীন রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দিয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিল। তবে তৎকালীন মুসলিম লীগ সমর্থক আলোচ্য সকল সংবাদপত্রই সম্ভব হলে সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানে নিয়ে আসার পক্ষপাতি ছিল। এইসব মিলে রাজনৈতিক মহলে একটা প্রচণ্ড বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, *আজাদ*-এর মালিক আকরম খাঁ *আজাদ*-এর পৃষ্ঠায় সে সময় বাংলার সঙ্গে আসাম যোগ করে 'বঙ্গাসাম' নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে উৎসাহী ও জোরালো বক্তব্য দিয়েছিলেন। আবার ১৯৫০ সালে (২৪ জুলাই) এসে দেখা যাচ্ছে যে, আকরম খাঁ-এর পত্রিকা *আজাদ* পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, পত্রিকাটি সোহরাওয়ার্দীর অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার ক্ষেত্রে সর্বদাই কাজ করেছে এবং তাতে সফলও হয়েছে। অর্থাৎ অখণ্ড বাংলার বিরোধী হয়েও বিভিন্ন সময়ে স্ববিরোধী মত দিয়ে *আজাদ*-এর মালিক আকরম খাঁ দুই পক্ষেই থাকার অবাস্তব চেষ্টা করেছিলেন। তবে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, *আজাদ* বঙ্গভঙ্গ অথবা অখণ্ড বঙ্গ প্রশ্নে কেবল জিন্নার মতামতই গ্রাহ্য করার পক্ষে ছিল। কিন্তু দেখা যায় যে, জিন্না একসময় কলকাতাসহ অখণ্ড সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে থাকলেও শেষ পর্যন্ত র‍্যাডক্লিফের পেন্সিলের দাগ দেওয়া সীমানা মেনে খণ্ডিত বাংলাকেই পাকিস্তানে গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়েছিলেন।

ইত্তেহাদ-এর তৎকালীন সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ অবশ্য দাবি করেছেন যে, তাঁর পত্রিকা *ইত্তেহাদ* শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ দেশভাগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কলকাতাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে অটল ছিল। অন্যদিকে *মিল্লাত* পত্রিকা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষে জোরালো অভিমত দিলেও এরূপ রাষ্ট্রকেই পাকিস্তান আখ্যায়িত করে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়েছিল। *মিল্লাত* কর্তৃপক্ষের এরূপ মতামত দেওয়ার সময় সম্ভবত একথা খেয়াল ছিল না যে, প্রায় সমান সংখ্যক হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রাষ্ট্র অখণ্ড বাংলা আর যাই হোক জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠন করা সম্ভব নয়।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, সে সময় বাংলার মুসলিম লীগ রাজনীতিতে এমনকি পাকিস্তান সমর্থক সাংবাদিকতায়ও মওলানা আকরাম খাঁ এবং আবুল হাশিম ছিলেন পরস্পরের ঘোর বিরোধী বা বলা যায় তাঁরা ছিলেন বিবদমান দুই পক্ষের নেতা। আকরম খাঁ তখন বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি এবং দলের

রক্ষণশীল অংশের প্রতিনিধি, অন্যদিকে দলের সেক্রেটারি আবুল হাশিম ছিলেন দলের প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধি। ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ আইন প্রণেতাদের কনভেনশনে জিন্নার বিরাগভাজন হবেন জেনেও আবুল হাশিম মূল লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখ করে ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়েছিলেন। অন্যদিকে আকরম খাঁ ছিলেন জিন্নার সকল ন্যায়-অন্যায় আচরণের অন্ধ সমর্থক। এই দুই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রত্যেকেরই নিয়ন্ত্রাণাধীন ছিল এক একটি পত্রিকা, যেগুলোকে চরিত্রের দিক থেকে প্রায় 'প্রচারপত্র' বলা যায়। *আজাদ* তখন সাধারণ বাঙালি মুসলমান সমাজে খুবই জনপ্রিয়। অন্যদিকে *মিল্লাত* খুব জনপ্রিয় না হলেও চিন্তাশীল বাঙালি মুসলমান শিক্ষিত নাগরিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল এই পত্রিকার পাঠক। তাছাড়া *মিল্লাত*-এর পরিচালক আবুল হাশিম ছিলেন সুবক্তা এবং অত্যন্ত দক্ষ রাজনৈতিক সংগঠক। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে প্রগতিশীল আবুল হাশিম ও উদারনৈতিক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাংগঠনিক মেলবন্ধন ও দক্ষতা এবং অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য নির্বাচনী প্রচারের কারণেই নির্বাচনে মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন। নির্বাচনী প্রচারে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আকরম খাঁ কখনোই খুব উৎসাহী ছিলেন না। বহুল প্রচারিত *আজাদ*-ই ছিল আকরম খাঁ-এর রাজনৈতিক শক্তির প্রধান উৎস। হাশিম-আকরম তিক্ত রাজনৈতিক বিরোধে *আজাদ* ও *মিল্লাত* পত্রিকাকে বিতর্কের হাতিয়ার হিসেবে দুই পক্ষই প্রায় সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, আবুল হাশিমের বিরোধিতার ক্ষেত্রে *মর্নিং নিউজ* ও *স্টার অব ইন্ডিয়া*, *আজাদ*-এর সহযোগী ছিল।

আজাদ-এর সঙ্গে মিল্লাত-এর তিক্ত সম্পর্ক কী পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা ১৯৪৭ সালের প্রথমদিকে *আজাদ*-এর একটি মন্তব্য থেকেই বোঝা যাবে। এই সময় আবুল হাশিমকে *আজাদ*-এর ভাষায় 'মোছলেম বাংলার সব চাইতে অপ্রিয় ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করা হয়। এসময় আবুল হাশিম বাংলা মুসলিম লীগের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, *মিল্লাত*-এর সম্পাদক পদে থেকে প্রগতিশীল চেতনার সাংবাদিক কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস *মিল্লাত* পরিচালনায় আবুল হাশিমকে সহযোগিতা করেছিলেন।

১৯৪৭ সালের প্রথম দিক থেকে ব্যক্তি সোহরাওয়ার্দী এবং অবিভক্ত বাংলায় তাঁর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভার উপর *আজাদ* তীব্র আক্রমণাত্মক সমালোচনার তীর ছুঁড়তে থাকে। বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে *আজাদ* এবং *ইত্তেহাদ*-এর মধ্যেও বাক-বিতণ্ডা তীব্রতর ও সংযমহীন হয়ে ওঠে। *আজাদ* বহুল প্রচারিত হওয়ায় *আজাদ-ইত্তেহাদ* বিতর্কে পার্লামেন্টারি দলের আসন্ন নেতা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সোহরাওয়ার্দী পিছিয়ে পড়েন বলে অনেকের ধারণা। *আজাদ* তথা আকরম খাঁ ছাড়াও পার্লামেন্টারি দলের নেতা (যিনি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন) নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দীর বদলে খাজা নাজিমউদ্দিনের প্রতি

জিন্নারও সমর্থন ও আশীর্বাদ ছিল। শেষ পর্যন্ত *আজাদ*-এর সমর্থিত প্রার্থী খাজা নাজিমউদ্দিনই জয়লাভ করেন। অবশ্য এই সময় *আজাদ*-এর মতো এত সর্বাত্মকভাবে না হলেও *মর্নিং নিউজ*-ও খাজা নাজিমউদ্দিনের পক্ষ অবলম্বন করে। *স্টার অব ইন্ডিয়া* সোহরাওয়ার্দী-বিরোধী হলেও পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচনে অনেকটা নিরপেক্ষ ছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে পাকিস্তানের সম্ভাব্য রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বা তর্কে *আজাদ* বাংলা ভাষার পক্ষে থাকলেও মাঝে মাঝে উর্দুর পক্ষে দোদুল্যমান হয়ে পড়ত। কিন্তু বাংলা ভাষার পক্ষে *ইত্তেহাদ*-এর ভূমিকা ছিল স্পষ্ট ও নিরঙ্কুশ। *মর্নিং নিউজ* সর্বদাই ছিল উর্দুর পক্ষে।

আজাদ ও *ইত্তেহাদ*-এর বিরোধ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও শেষ হয়ে যায়নি। কলকাতায় প্রকাশিত পাকিস্তান সমর্থক পত্রিকাগুলোর মধ্যে কেবল *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ*-ই পাকিস্তানে অর্থাৎ রাজধানী ঢাকায় আসতে পেরেছিল। *ইত্তেহাদ* অনেক চেষ্টা করেও নাজিমউদ্দিন সরকারের অসহযোগিতার কারণে ঢাকায় আসতে পারেনি। এ ব্যাপারে কোনো কোনো প্রকাশনায় *ইত্তেহাদ*-ও কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল বলে উল্লেখ থাকায় আমি বিস্মিত হয়েছি। *ইত্তেহাদ* নামে দেশভাগের পর ঢাকায় যে পত্রিকা প্রকাশিত হযেছিল, তার সঙ্গে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সোহরাওয়ার্দীর মালিকানাধীন *ইত্তেহাদ*-এর কোনো সম্পর্কই ছিল না। কলকাতার *ইত্তেহাদ*-এর ঢাকা স্থানান্তরে ব্যর্থতা সম্পর্কে আমি বাংলা একাডেমী পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

মূলত ঢাকায় আসতে না পারার কারণেই *ইত্তেহাদ* বন্ধ হয়ে যায়। প্রাদেশিক সরকার কলকাতা থেকে ডাক ও বিমানযোগে আসা *ইত্তেহাদ*কে কয়েকবার পূর্ব পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করেছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সে সময় নাজিমউদ্দিন সরকার শুধু *ইত্তেহাদ*ই নয়, বরং *ইত্তেহাদ*-এর মালিক অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সোহরাওয়ার্দীকেও পূর্ব পাকিস্তানে আসতে দেয়নি।

এই আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করে ধৈর্যচ্যুতি ঘটানো ঠিক হবে না। তবে এ কথা বলা যায় যে, বাংলায় এ সময়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদপত্রগুলোকেই সাবেক পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতি ও সাংবাদিকতার জন্মলগ্নের সূচনাকারী বলা যায়। রক্ষণশীল এবং অনেকটাই সুবিধাবাদী রাজনীতিক, কিন্তু দক্ষ সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সংগঠক ও পরিচালক মওলানা আকরম খাঁ সেই সময়ের রাজনীতি ও সাংবাদিকতায় স্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর পরিচালিত *আজাদ* সেই সময়ে বাঙালি মুসলমানদের কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য বাংলা ভাষার একটা প্যাটার্ন তৈরি করেছিল, যা থেকেই আজকের এ দেশের বাংলা সংবাদপত্র ও অফিস আদালতে ব্যবহারযোগ্য ও কার্যকর বাংলা গদ্য সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরা চলে। রাজনীতিতে আকরম

খাঁ জিন্নার ক্রীড়নক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু বাঙালি মুসলমান জনগণদের মধ্যে জিন্নার অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর পত্রিকা *আজাদ*-এর সাফল্য ছিল ঐতিহাসিক। বিপুল সরকারী সহযোগিতা পেয়ে আকরম খাঁ *আজাদ*কে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন এবং এখানেও মুসলিম লীগ সরকারের সমর্থক ছিল পত্রিকাটি।

বাঙালি মুসলমান রাজনীতিকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিভাবান, অসাম্প্রদায়িক, সাহসী, শিক্ষিত ও দক্ষ, দেশপ্রেমিক কিংবা বলা যায় বাঙালি-প্রেমিক ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সময়ে জিন্নার সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাতের পরিণতিতে মুসলিম লীগ থেকে তিনি ছিলেন বহিষ্কৃত। ফলে তাঁর নিজের বা তাঁর নিয়ন্ত্রাধীন পত্র-পত্রিকার মুসলিম লীগ রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল না। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফজলুল হক পাকিস্তান হওয়ার প্রাক্কালে মুসলিম লীগে পুনরায় যোগদান করলে *আজাদ* পত্রিকা তাকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেছিল। এখানে বলে রাখা ভালো যে, ফজলুল হক এক সময় সর্বভারতীয় কংগ্রেসেরও মহাসচিব ছিলেন এবং বাঙালি মুসলমান রাজনীতিকদের মধ্যে তাঁরই ব্যাপক সর্বভারতীয় পরিচিতি ছিল। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিক হিসেবে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের কাছেই তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। *ইত্তেহাদ* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যিনি আলোচ্য কালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তাঁরও শিক্ষা-দীক্ষা, মেধা ছিল অসাধারণ এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবেও তাঁর প্রচুর সুনাম ছিল। বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে তিনি ছিলেন এক অনন্য রাজনীতিক ও দক্ষ প্রশাসক। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইংরেজ আমলাদের কাছেও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি মূলত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শিষ্য ও সহযোগী হিসেবে রাজনীতিতে বিশেষ পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। সেই সময়ের মুসলমান রাজনীতিকদের পক্ষে মুসলিম লীগ রাজনীতির বাইরে গিয়ে টিকে থাকা কঠিন ছিল। তাই স্বভাব ও মননে উদারনৈতিক এবং অসাম্প্রদায়িক হয়েও মুসলিম লীগ রাজনীতির অনিবার্য প্রয়োজনে তাকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পক্ষেই কাজ করতে হয়েছিল। তবে তাঁর পত্রিকা (যার সম্পাদক ছিলেন দক্ষ রাজনীতিক ও সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ) মোটামুটিভাবে লীগ রাজনীতির আবহে থেকেও অনেকটাই যুক্তিবাদী ভূমিকা গ্রহণের প্রয়াস পেয়েছিল। *মিল্লাত* পত্রিকা পরিচালনাকারী আবুল হাশিম ছিলেন মুসলিম লীগ মহলের 'বামপন্থী' অংশের নেতা। বাংলা মুসলিম লীগের নির্বাচিত সম্পাদক আবুল হাশিম ছিলেন একাধারে জ্ঞানী, অসাধারণ বাগ্মী ও অত্যন্ত কর্মঠ রাজনৈতিক সংগঠক। ইসলামী শিক্ষায় দক্ষ হওয়ায় তাকে 'আল্লামা' আবুল হাশিমও বলা হতো। তিনি চোখের অসুখে ভুগে শেষ বয়সে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরও লীগ মহলের সুশিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁকে অনেক সম্মানিত আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁর পত্রিকার বিষয়বস্তু, ভাষা ও যুক্তি ছিল তীক্ষ্ণ, তীব্র, সাহসী ও ব্যতিক্রমী। কিন্তু লীগের রক্ষণশীল মহলের বেপরোয়া

আক্রমণ ও শত্রুতার ফলে তিনি এবং তাঁর পত্রিকা শেষ পর্যন্ত খুব কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে নি। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আবুল হাশিমের এবং সেই সাথে *ইত্তেহাদ*-এর সঙ্গে *মিল্লাত*-এর সম্পর্ক ছিল অম্লমধুর। কখনো ছিল তা সম্প্রীতির কখনো তা ছিল বিরোধিতার। তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ প্রায়ই অত্যন্ত কার্যকর ইতিবাচক ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছে। আবুল মনসুর আহমদের সম্পাদনায় *ইত্তেহাদ* উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।

মিল্লাত পত্রিকা অযথা কংগ্রেস ও হিন্দু বিরোধিতার চাইতে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে মুসলমানদের নির্যাতিত ও অধিকারহারা হিসেবেই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। *মিল্লাত*-এর কথা ছিল একটি নির্যাতিত ও অধিকারবঞ্চিত সম্প্রদায় হিসেবে ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তির জন্যই পাকিস্তান দরকার। *মিল্লাত* একই সঙ্গে দেশে পূর্ণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ভারতে ইস্পাহানী গ্রুপ ছিল মূলত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা এসেছিলেন ইরান থেকে। জিন্না রাজনীতি করতে গিয়ে আর্থিক কারণেই ধনী ইস্পাহানীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছিলেন। সে জন্যই ইস্পাহানী বাঙালি না হওয়া সত্ত্বেও জিন্না তাঁকে বাংলা মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ করেছিলেন। রাজনীতির চাইতে ব্যবসাই ইস্পাহানীদের কাছে বড় ছিল। তবে যদি পাকিস্তান হয়ে যায়, তবে সেখানে বড় হিন্দু ব্যবসায়ীদের অনুপস্থিতিতে ইস্পাহানীরা ও মুসলমান বড় ব্যবসায়ীরা একচ্ছত্র ব্যবসায়িক আধিপত্য বজায় রাখার সুযোগ পাবে, সেই সম্ভাবনাতেই তারা জিন্নাভক্ত হয়েছিল বলা যায়। তারা খুব একটা বৃটিশবিরোধীও ছিল না। তাই তাদের পত্রিকা *স্টার অব ইন্ডিয়া*-তেও এই নীতি ও মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছিল। ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে এ ধরনের কোনো অস্থিতিশীল পরিবেশের তারা বিরোধী ছিল। তবে যেকোনো অবস্থায় রাজনীতিতে তারা জিন্নার পক্ষাবলম্বনের নীতি মেনে চলেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অবশ্য তারা তাদের পত্রিকা পাকিস্তানে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়নি। আবুল হাশিমও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অনেকটা সময় তার জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গে থেকে যান। ফলে *মিল্লাত*-এরও পাকিস্তানে আসার প্রশ্ন ওঠেনি।

মর্নিং নিউজ ছিল মূলত অবাঙালি স্বার্থের প্রতিনিধি। ঢাকার নওয়াব পরিবার মূলত কাশ্মীর থেকে এ দেশে এসেছিলেন বলে দাবি করেন। কাজেই নওয়াব পরিবারের খাজারা নিজেদের বাঙালি বলে মনে করতেন না। সেই খাজা পরিবারেরই পত্রিকা ছিল *মর্নিং নিউজ*। খাজা নাজিমউদ্দিনের শ্যালক খাজা নুরউদ্দিন ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। ঢাকা ছাড়াও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে (উদাহরণস্বরূপ বরিশালে) খাজাদের জমিদারী থাকলেও তারা সবসময়ই অবাঙালি স্বার্থের সঙ্গেই নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছিল। কলকাতার অবাঙালি মুসলমানদের একটি বৃহৎ সম্প্রদায় ছিল, *মর্নিং নিউজ* মূলত সেই সম্প্রদায়েরই স্বার্থের ধারক-বাহক ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর খাজা নাজিমউদ্দিন

পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশ পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় *মর্নিং নিউজ* সহজেই সরকারী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে ঢাকায় স্থানান্তরিত হতে পেরেছিল। *মর্নিং নিউজ* সম্পাদকের জন্য তখন ঢাকায় বিরাট সরকারী বাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছিল। অবাঙালি স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার নীতি *মর্নিং নিউজ* বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যথারীতি বজায় রেখেছিল।

আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র, যা একসময় পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ (পরে পূর্ব পাকিস্তান) প্রদেশ ছিল, তারই জন্মলগ্নের রাজনীতি ও সাংবাদিকতার মিথস্ক্রিয়ার কালটিকেই আমি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। আমার সাফল্য ব্যর্থতা পুরোটাই আজকের পাঠক-শ্রোতাদের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

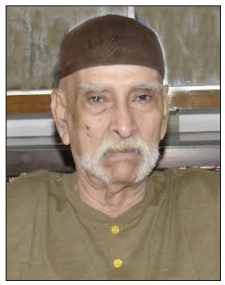

যিনি আজীবন সম্মাননা পেলেন

শাহেদ কামাল

বিশিষ্ট সাংবাদিক শাহেদ কামাল ১৯৪০ সালের ২৪ জুলাই অবিভক্ত ভারতের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি, সমাজকর্মী, নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সুফিয়া কামাল তাঁর মা। তাঁর বাবা কামাল উদ্দিন আহমদ খানও সাহিত্যিক ছিলেন।

কলকাতায় লিটল ফ্লাওয়ারস ডে স্কুলে ছয় বছর বয়সে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তবে ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তাঁরা ঢাকায় চলে আসেন এবং ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। পিতৃসূত্রে তাঁর মূল আবাস চট্টগ্রামের চুনতিতে।

ঢাকার নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হন তিনি। পরে তিনি ঢাকা সিটি নাইট কলেজ থেকে ১৯৬২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন। কলেজটি বর্তমানে ঢাকা সিটি কলেজ নামে পরিচিত।

শাহেদ কামাল ১৯৬৬ সালে তৎকালীন কায়েদে আজম কলেজ তথা এখনকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করার পর ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। এর পরে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭২ সালে তিনি সাংবাদিকতায় এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, লেখালেখি, অনুবাদ ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন। ১৯৫৭ সালে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে ঢাকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা বাংলা ও ইংরেজি প্রতিবেদন, সংগীত, চিত্র ও নাট্যকলা বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং পুস্তক পর্যালোচনা প্রকাশের সূচনা ঘটে। এক পর্যায়ে ঢাকার ইংরেজি সাপ্তাহিক *উইকলি হলিডে*-তে নিয়মিত তাঁর নিবন্ধ প্রকাশিত হতে শুরু করে।

সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জনের পরের বছর ১৯৬৮ সালে তিনি পাকিস্তান

প্রেস ইন্টারন্যাশনালের ঢাকা দপ্তরে সহ-সম্পাদক হিসাবে কাজ শুরু করেন। ১৯৭২ সালে তিনি ঊর্ধতন সহ-সম্পাদক হিসাবে *বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায়* (*বাসস*) যোগ দেন। ২০০২ সালে ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসাবে তিনি *বাসস* থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পরের বছর সম্পাদকীয় উপদেষ্টা হিসাবে ইংরেজি দৈনিক *দ্যা ডেইলি স্টার*-এ কাজ শুরু করেন তিনি।

উচ্চ মাধ্যমিকের পর ১৯৬২ সালে ঢাকার একটি শিশু বিদ্যালয়ে ক্রীড়া ও ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন শাহেদ কামাল। এর ধারাবাহিকতায় কর্মজীবনের মূল পরিসরে পূর্ণকালীন সাংবাদিকতার মাঝেও তিনি ফিরে যান খণ্ডকালীন শিক্ষকতায়। তবে এবার সাংবাদিকতা পড়ানো শুরু করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে। ১৯৭৬ সাল থেকেই তিনি এই বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শাহেদ কামালের বিচরণ রয়েছে অনুবাদ জগতেও। দেশি ও বিদেশি অনেক লেখকের লেখা অনুবাদ করেছেন তিনি। কাজ করেছেন বাংলা থেকে ইংরেজি, ইংরেজি থেকে বাংলা – উভয় ক্ষেত্রেই।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এই কৃতি সাংবাদিক সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতা প্রতিষ্ঠান সোসাইটি ফর কনজারভেশন অব নেচার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (এসসিওএনই) ও বাংলাদেশ পুরাতন স্কাউট ও গাইড সংস্থার সাথেও যুক্ত আছেন।

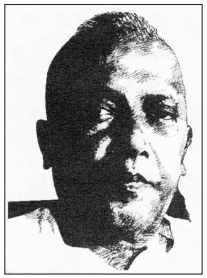

যাঁর নামে ট্রাস্ট

সম্পাদক আবদুস সালাম

এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আরও অনেকের মতো যে মানুষটি অব্যাহতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন কলম দিয়ে সেই কলমযোদ্ধা পথিকৃৎ সাংবাদিকের নাম আবদুস সালাম। পাকিস্তান আমলের বিরোধী কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত *পাকিস্তান অবজারভার* তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের বৈষম্যের বিরুদ্ধে যেভাবে সোচ্চার ছিল তা এ দেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আর এই অধ্যায় রচনায় সুদীর্ঘ সময় ধরে দুঃসাহসিকভাবে এই পত্রিকাটির নেতৃত্ব দিয়েছেন সম্পাদক আবদুস সালাম। স্বাধীনতার পূর্বে *দি পাকিস্তান অবজারভার* এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে *দি বাংলাদেশ অবজারভার*-এর সম্পাদক হিসেবে তিনি এই পত্রিকার দায়িত্ব পালন করেন।

সাংবাদিক আবদুস সালামের মধ্যে ছিল জ্ঞানের গভীরতা। পাণ্ডিত্য আর প্রজ্ঞায় তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্ব। সত্য প্রকাশের দুরন্ত সাহস, পেশাগত নির্ভীকতা ও একনিষ্ঠতা তাঁকে এদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে অধিষ্ঠিত করেছে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং পথিকৃৎ সাংবাদিকরূপে।

নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া থানার দক্ষিণ ধর্মপুর গ্রামে ১৯১০ সালের ২ আগস্ট আবদুস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দলিলুর রহমান ও মাতার নাম আজিজুন নেছা চৌধুরানী। আবদুস সালাম ফেনী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে তিনি বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেন। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৩০ সালে তিনি অর্থনীতিতে অনার্স ডিগ্রি এবং ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানসহ এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

আবদুস সালাম কর্মজীবন শুরু করেন ফেনী কলেজের ইংরেজির প্রভাষক হিসেবে। অতঃপর তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে সরকারের আয়কর বিভাগের চাকরিতে যোগ দেন।

এরপর পর্যায়ক্রমে তিনি সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে এবং অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে বাঙালি অফিসারসহ সমস্ত বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর যে অত্যাচার-অবিচার চলছিল তার প্রতিবাদ জানাতেই মূলত তিনি সরকারি চাকরিরত অবস্থায় কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন। *পাকিস্তান অবজারভার*-এ 'ইকোনমিক নোটস' নামে ছদ্মনামে তিনি একটি কলাম লিখতেন তখন। তাঁর এই কলামের মাধ্যমে তিনি পাকিস্তানের দু'অংশে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন কেন প্রয়োজন তা খুবই শাণিত যুক্তি ও জোরালো ভাষায় তুলে ধরতেন। ছদ্মনামে লিখতেন বলে পাঠকদের মধ্যে খুব কম লোকই জানতেন সেই জনপ্রিয় কলামটির লেখকের আসল নাম।

এই কলাম এবং সেইসঙ্গে *পাকিস্তান অবজারভার* পাঠকমহলে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পত্রিকাটি ইংরেজি ভাষায় হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানি পাঠকদের কাছেও পূর্ব পাকিস্তানের সেন্টিমেন্ট দিনে দিনে স্পষ্ট হতে থাকে। বলা যেতে পারে, 'ইকোনমিক নোটস' কলামটির মাধ্যমেই আবদুস সালাম সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত হন। সেসময় মাঝে মাঝে তিনি *অবজারভার*-এর জন্য সম্পাদকীয়ও লিখতেন।

এই শাণিত কলম-সৈনিক মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে রক্ষার প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই এক পর্যায়ে সরকারি চাকরি ছেড়ে সার্বক্ষণিক সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে *পাকিস্তান অবজারভার*-এ যোগ দেন এবং ১৯৫০ সালের ৩ জুন তিনি এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সম্পাদক পদে যোগ দিয়ে তিনি পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি অফিসেই থাকতেন। তিনি নিজে লিখতেন, অন্যের লেখা পরিমার্জনা করতেন, পত্রিকা নিয়ে পরিকল্পনা করতেন। এভাবেই তিনি কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে *পাকিস্তান অবজারভার*কে একটি শীর্ষস্থানীয় কাগজে পরিণত করেন।

আবদুস সালাম ছিলেন নির্ভীক প্রকৃতির মানুষ। তাঁর সমগ্র কর্মজীবনে প্রকাশ পেয়েছে এই গুণটি। ১৯৬৩-৬৪ সালে আইয়ুব সরকার প্রণীত সংবাদপত্রবিরোধী কালা-কানুনের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সে সময়ের ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান রচিত গ্রন্থ *ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস*-এ বাঙালিদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যের সমালোচনা ও নিন্দা প্রকাশ করেন। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে একজন সাংবাদিক হিসেব আবদুস সালাম যেভাবে লড়াই করেছেন তা এ দেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায়। তাছাড়াও সম্পাদকীয় মতামতের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে তিনি জাতীয় জীবনে প্রতিবাদের ঝড় তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন *পাকিস্তান অবজারভার*-এর অদ্বিতীয় সম্পাদক। সে সময়ে পত্রিকাটি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষায় বেশ কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে

লেখালেখি করেছিল যা তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের মনঃপুত ছিল না। সরকার তখন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল পত্রিকাটি বন্ধ করার জন্য। আবদুস সালামের 'Crypto Fascism' সম্পাদকীয় প্রকাশের পর মুসলিম লীগ সরকার সেই সুযোগ পেয়ে যায়। তাঁর সম্পাদকীয় মুসলমানদের সত্তাকে আঘাত করেছে এই অভিযোগ এনে মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি *পাকিস্তান অবজারভার* নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর পরদিন ১৩ ফেব্রুয়ারি আবদুস সালাম এবং পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন। সাধারণ নির্বাচনের আগে আবদুস সালাম রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হন এবং যুক্তফ্রন্টের মনোনীত সদস্য হিসেবে ফেনী উত্তর আসন থেকে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদে জয়লাভ করেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয় এবং যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়লাভ করে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর *পাকিস্তান অবজারভার*-এর প্রকাশনা আবার শুরু হয় এবং আবদুস সালাম এ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তখন সমগ্র পাকিস্তানে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

পূর্ব পাকিস্তান আইন পষিদের সদস্য নির্বাচিত হলেও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে তিনি নিজেকে পুরোপুরিভাবে মানিয়ে নিতে পারেননি। এমতাবস্থায় তিনি পেশাদার সম্পাদক হিসেব *পাকিস্তান অবজারভার* সম্পাদনায় এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেন যে কয়েক বছরের মধ্যেই *পাকিস্তান অবজারভার* সাংবাদিকতা জগতে গতানুগতিক ধারার বিপরীতে প্রযুক্তি-কৌশল এবং পেশাগত ধ্যান-ধারণায় একটি আধুনিক ও জনপ্রিয় ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়। সাংবাদিকতায় নবতর ধারা সংযোজনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবির পক্ষে পত্রিকাটি এ সময় ব্যাপক জনমত গড়ে তোলে যা ক্রমশ বৃহত্তর আন্দোলনে রূপ নেয়।

সমগ্র পাকিস্তানে নেতৃস্থানীয় সম্পাদক হওয়ায় আবদুস সালাম ১৯৬৩-৬৪ সালে 'পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদনা পরিষদ'-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সন থেকে ১৯৭২ সন পর্যন্ত তিনি একটানা ২২ বছর *পাকিস্তান অবজারভার*-এর সম্পাদক ছিলেন। পাঠকদের কাছে *অবজারভার* আর আবদুস সালাম নাম দুটি যেন সমার্থক হয়ে উঠেছিল। সে সময় ইংরেজি পত্রিকা হিসেবে *পাকিস্তান অবজারভার* যে মর্যাদা ও কৌলিন্য লাভ করেছিল তা সম্ভব হয়েছিল তাঁর মতো একজন সুশিক্ষিত ও প্রজ্ঞাবান সম্পাদকের নেতৃত্বের বদৌলতে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সরকার *পাকিস্তান অবজারভার* পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। নতুন নাম হয় *বাংলাদেশ অবজারভার*। তিনি পত্রিকাটির সম্পাদক পদে বহাল থাকেন। তবে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এটি তখন এক অর্থে সরকারি পত্রিকা। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে সারা দেশে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আর তিনি তখন

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির পটভূমিতে তাঁরই সম্পাদিত এই পত্রিকায় 'The Supreme Test' (১৫ই মার্চ, ১৯৭২) শিরোনামে সম্পাদকীয় লেখেন। এই সম্পাদকীয়তে তিনি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি মন্তব্য করেন: "The Awami League Government is today in a peculiar position. Although the party was elected overwhelmingly by the people, the government we have today is not an elected representative and constitutional government, because of the fact that there is no constitution yet and there is, therefore, no democratic legal basis for its existence. It holds office by virtue of coming out victorious in a revolutionary war and is therefore a revolutionary, provisional government ..."

নাতিদীর্ঘ এ সম্পাদকীয়-এর মূল বক্তব্য ছিল: যদি আওয়ামী লীগ সরকার গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে অতি শীঘ্রই একটি সংবিধান প্রণয়ন করে নির্বাচন এর আয়োজন করতে হবে এবং ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠন করে এর বৈধতা আনতে হবে। আওয়ামী লীগের বিশ্বাস তারা জনপ্রিয়। কিন্তু সুপ্রিম টেস্টের মাধ্যমে তাদের প্রমাণ করতে হবে যে তারা সত্যিই জনপ্রিয়।

কিন্তু সরকারের কাছে এই সম্পাদকীয় গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সৃষ্ট মতিবিরোধের এক পর্যায়ে তাঁকে *বাংলাদেশ অবজারভার*-এর সম্পাদকের পদ থেকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়।

সাংবাদিকতা পেশা থেকে অবসর নেয়ার পর মাঝে মাঝে বিভিন্ন পত্রিকায় (*মর্নিং নিউজ*, *বাংলাদেশ টাইমস*, *ইত্তেফাক*) উপ-সম্পাদকীয় লেখা ছাড়া সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর আর কোনো সক্রিয় যোগাযোগ লক্ষ করা যায়নি।

আবদুস সালাম স্বীয় পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা ও পেশাগত দৃঢ়তার কারণে সাংবাদিক সমাজে শ্রদ্ধার আসনে অনন্তকাল ধরে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। তিনি তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য, নীতিবোধ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে সুদীর্ঘ সময় ধরে *পাকিস্তান অবজারভার*কে একটি বিশিষ্ট দৈনিকে পরিণত করেছিলেন। সাংবাদিকতার মান ও ইংরেজি ভাষার যথার্থ ব্যবহারে *পাকিস্তান অবজারভার* শুধু পাকিস্তানেই নয়, বিদেশেও বিশিষ্ট দৈনিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। সাংবাদিকতা পেশায় সরাসরি সম্পৃক্ত না থেকেও তিনি *অবজারভার*-এর সূচনাকালে যেসব ইংরেজি সম্পাদকীয় লিখতেন তা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল মূলত ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে তাঁর মুন্সিয়ানার কারণে। ইংরেজি ভাষায় শুধু নয়; সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর দক্ষতা যে কত গভীর ও প্রখর ছিল তার প্রমাণ *অবজারভার*-এ লেখা তাঁর 'ইকনোমিক নোটস' কলাম। হিউমারিস্ট হিসেবেও

তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। এ ছাড়া 'মাল্‌স' ছদ্মনামে তিনি 'আইডল থটস্' শীর্ষক একটি ব্যঙ্গাত্মক কলাম লিখতেন। স্যাটায়ার রচনায়ও তিনি ছিলেন যথেষ্ট পারদর্শী। সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১৯৭৬ সালে দেশবরেণ্য সম্পাদক আবদুস সালাম 'একুশে পদক' পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৭৬ সালে কর্মরত সাংবাদিকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ ও গণমাধ্যম বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই বছরই তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট-এর প্রথম মহাপরিচালক পদে নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। প্রেস ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক পদে কর্মরত থাকাবস্থায় ১৯৭৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

যাঁর উদ্যোগে ট্রাস্ট

এবিএম মূসা

সাংবাদিক, কলাম-লেখক আবুল বাশার মুহাম্মদ (এবিএম) মূসা বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় প্রবাদতুল্য পুরুষ। পঞ্চাশ দশক থেকে আজ অবধি দেশের সংবাদ মাধ্যমের ক্রমবিবর্তনের পথে যাঁরা অবিস্মরণীয় অবদান রেখে চলছেন এবিএম মূসা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার কুতুবপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আশরাফ আলী ছিলেন সে সময়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর মায়ের নাম মাজেদা খাতুন। তারুণ্যের শুরুতেই রাজনৈতিক চেতনা তাঁকে শিহরিত করতো। তিনি জীবনকে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন ভিন্নমাত্রায়, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

বাবার বদলির সুবাদে চট্টগ্রামের গভর্নমেন্ট মোসলেম হাই স্কুলে মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশুনা করেছেন এবিএম মূসা। ১৯৪৫ সালে তাঁর বাবা আবার নোয়াখালী ফিরে এলে নোয়াখালী জেলা স্কুল ভর্তি হন তিনি। ১৯৪৬ সালে তিনি এ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট ও চৌমুহনী কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন।

কলেজ জীবন থেকেই এবিএম মূসা লেখালেখির সাথে জড়িত ছিলেন। চৌমুহনী কলেজে ছাত্রাবস্থাতে তিনি *কৈফিয়ত* নামে একটি পত্রিকা বের করতেন। এছাড়া ফেনীতে খাজা আহমদের সাপ্তাহিক *সংগ্রাম*-এও নিয়মিত লিখতেন। এরপর বিএ পরীক্ষা দিয়ে ১৯৫০ সালে ঢাকায় এসে তিনি *ইনসাফ* পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। পেশাগত সাংবাদিকতার শুরুর দিকে এক দল সাংবাদিক বের হয়ে আসেন, তাদের অনেকে যোগ দেন *ইনসাফ* পত্রিকায়। এর বার্তা সম্পাদক ছিলেন কেজি মুস্তাফা। এই *ইনসাফ* পত্রিকায় তিন মাস কাজ করার পর এবিএম মূসা শিক্ষানবিশ সহ-সম্পাদক হিসেবে ১৯৫০ সালের নভেম্বরে *পাকিস্তান অবজারভার*-এ যোগ দেন। অ্যাডভোকেট

শেহাবুদ্দিন আহমদ তখন *অবজারভার*-এর নামমাত্র সম্পাদক, মূল কাজ করতেন আবদুস সালাম। সৈয়দ নূরুদ্দীন তখন *অবজারভার*-এর বার্তা সম্পাদক ছিলেন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন ছাপার কারণে *পাকিস্তান অবজারভার* বন্ধ হয়ে গেলে এবিএম মূসা দৈনিক *সংবাদ*-এ যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে আবার *অবজারভার* প্রকাশিত হলে সেখানে তিনি সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে তিনি এ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হন। ১৯৬১ সালে কমনওয়েলথ প্রেস ইনস্টিটিউটের বৃত্তি নিয়ে তিনি লন্ডনে যান। অক্সফোর্ডে কুইন এলিজাবেথ হাউজে তিনি সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি *অবজারভার*-এর সনাতনী চেহারা বদলে দেন। সেখানে যুক্ত করেন নতুন বিষয় ও নবতর অঙ্গসজ্জা। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি *অবজারভার*-এর বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করেন। বার্তা সম্পাদক হিসেবে তাঁর সাহস ও দৃঢ়তাই *পাকিস্তান অবজারভার*কে ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার করে তোলে। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান ও বহির্বিশ্ব বাঙালির মনের কথা জানতে পারতো *পাকিস্তান অবজারভার* পড়ে। ১৯৬০-এর দশকে এবিএম মূসা বাংলাদেশের পত্রিকায় কাজ করার পাশাপাশি *বিবিসি*, লন্ডনের *দি টাইমস*, *দি ইকোনমিস্ট*সহ বিভিন্ন বিদেশি গণমাধ্যমের বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। *দি টাইমস*-এর প্রখ্যাত সাংবাদিক হ্যারল্ড ইভান্সের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে হ্যারল্ড ইভান্সের উদ্যোগ এবিএম মূসা হংকং-য়ে যান। আবার হ্যারল্ড ইভান্সের পরামর্শ মোতাবেকই সেখান থেকে মুজিবনগরে গিয়ে যুদ্ধের খবরাখবর সংগ্রহ করে বিদেশি গণমাধ্যমে পাঠাতেন। হংকংভিত্তিক বার্তা সংস্থা এশিয়ান নিউজ এজেন্সির মাধ্যমে এবিএম মূসা ভারত থেকে যুদ্ধের খবর *বিবিসি*কে জানাতেন। কেননা একাত্তরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ভারতে *বিবিসি*র কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

মুক্তিযুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে আর কোনো পত্রিকায় যোগ দেননি এবিএম মূসা। এ সময়ে তিনি *বিবিসি*, লন্ডনের *দি টাইমস*, *নিউইয়র্ক টাইমস* ও *ইকোনমিস্ট* পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর তিনি *বাংলাদেশ টেলিভিশন*-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে নিয়োগ পান। এর কিছুদিন পর তিনি *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭৩ সালে এবিএম মূসা আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর তিনি আবার লন্ডনে চলে যান। সেখানে তিনি *সানডে টাইমস* পত্রিকায় রিসার্চ ফেলোর কাজ পান। বিদেশে তিনি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ইউএসইপির আঞ্চলিক তথ্য পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। দেশে ফিরে তিনি প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের মহাপরিচালক এবং তারপর বার্তা সংস্থা *বাসস*-এর প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে কাজ করেন।

প্রথম আলো-র সম্পাদক মতিউর রহমানের অনুরোধ ও উৎসাহে এবিএম মূসা কলামিস্ট হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯৯৫ সালের ১৮ মার্চ *ভোরের কাগজ*-এ তাঁর প্রথম কলাম 'আবদুল গাফফার চৌধুরী বন্ধুবরেষু' ছাপা হয়। এরপর তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখছেন। ইংরেজি সাপ্তাহিক *কুরিয়ার*-এও তিনি দুই বছর লিখেছেন। ১৯৯১ সালে *নিউজ ডে* নামে একটি ইংরেজি দৈনিকে সম্পাদক হিসেবে বছর খানেক কাজ করেন। ২০০৪ সালে কিছুদিন তিনি দৈনিক *যুগান্তর*-এর সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

এবিএম মূসা পাকিস্তানের সাংবাদিক ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম কর্তা ছিলেন। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। তিনি চারবার প্রেসক্লাবের সভাপতি ছিলেন এবং তিনবার সম্পাদক ছিলেন। প্রয়াত এসএম আলী যখন ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে পাকিস্তান জার্নালিস্টস ওয়েজ বোর্ডের সদস্য, এবিএম মূসা তখন ঐ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নেরও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সে সময়েই প্রথম বেতন বোর্ড রোয়েদাদ কার্যকর হয়।

১৯৬৫ সালে তাসখন্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে চুক্তি সম্পাদন করার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশসহ বিভিন্ন কারণে এবিএম মূসা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুস সালামের বড় জামাতা। তাঁর স্ত্রী সেতারা মূসা, মেয়ে পারভিন সুলতানা ঝুমা প্রত্যেকেই সাংবাদিকতা পেশায় পরিচিত নাম। ২০১৪ সালের ৯ এপ্রিল দেশবরেণ্য সাংবাদিক এবিএম মূসা পরলোকগমন করেন।

স্মারক বক্তা

অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান

অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান ১৯৪১ সালে ঢাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রয়াত ওয়াজেদ আলী খান ও মাতা প্রয়াত খলিকা আক্তার নূরবেগম। বৃটিশবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠলে তাঁর বাবা বৃটিশ প্রদত্ত 'খান সাহেব' উপাধি বর্জন করেন (নামের শেষের 'খান' অবশ্য পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত)। কর্মসূত্রে তাঁর পরিবার বৃটিশ আমলের শেষভাগে কলকাতায় অবস্থান করছিল। সেখানেই তাঁর শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁর পরিবার ঢাকায় চলে আসলে এখানকার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ল থেকে তিনি বিএ অনার্স (বাংলা, ১৯৬২), এমএ (বাংলা, ১৯৬৩), সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (১৯৬৩), এমএ (সাংবাদিকতা, ১৯৭০) এবং পিএইচডি (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ১৯৮৯) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং স্কলার ছিলেন (১৯৮৮)।

১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রায় দশ বছর জাতীয় সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৯৯২ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন এবং ২০০৮ সালে সিলেকশন গ্রেড অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দুই মেয়াদে (১৯৭৬-১৯৭৯ এবং ২০০৪-২০০৬) বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগেও তিনি খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘ বার বছর (১৯৯৭-২০০৮) গণযোগাযোগ বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। একাত্তরের স্বাধীনতার পর সাংবাদিকতার খ্যাতিমান শিক্ষক বর্তমানে প্রয়াত প্রফেসর ক.আ.ই.ম নুরউদ্দিনের সঙ্গে একযোগে কাজ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগকে ঢেলে সাজিয়ে পূর্ণাঙ্গ নতুন রূপ প্রদান করেন।

অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিয়েনে ইউনিভার্সিটি অব

লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এ (ইডল্যাব) দুই বছরের অধিককাল (২০০৪-২০০৬) সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ও মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভগের উপদেষ্টা হিসেবে অধিষ্ঠিত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ছাড়াও অধ্যাপক খান দীর্ঘদিন যাবৎ বহু সরকারী, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে এবং সংবাদমাধ্যমে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ক বক্তৃতা দিয়ে আসছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে এ পর্যন্ত তিনজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় পিএইচডি অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশ-বিদেশের স্বীকৃত গবেষণা জার্নাল ও পুস্তকে তাঁর ত্রিশটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। গণযোগাযোগ গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁর প্রিয় বিষয় 'সাংবাদিকতা ও রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া'। তিনি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর থেকে প্রকাশিত *ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন* শীর্ষক গবেষণা জার্নালের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য। গণযোগাযোগ সংক্রান্ত অনেক আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সভা-সমিতিতে তিনি অংশগ্রহণ ও প্রবন্ধ উপস্থান করেছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি পৃথিবীর পনেরটি দেশ সফর করেন। বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকসমূহে এবং অন্যান্য প্রকাশনায় তাঁর বহু লেখা এবং কলাম প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে।

অধ্যাপক খান বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাকালেই তার সদস্য ছিলেন এবং বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের (পিআইবি) শুরু থেকে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য হিসেবে পাঁচ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মিডিয়া ও প্রকাশনা সংক্রান্ত বেসরকারি সংস্থা সোইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (সেড)-এর সভাপতি। এছাড়া তিনি ছিলেন কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং সাউথ এশিয়া মিডিয়া এসোসিয়েশন (সামা)-এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সহ-সভাপতি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর প্রধান উপদেষ্টা। বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষাক্ষেত্রে জীবিত অধ্যাপকদের মধ্যে তিনি প্রবীনতম।

২০০৮ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে পাঁচ বছর সুপারনিউম্যারারি অধ্যাপক থাকার পর বর্তমানে অনারারি অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর স্ত্রী সমাজকর্মী মালেকা খান। তাঁদের এক মেয়ে, এক ছেলে ও দুই নাতি রয়েছে।

শিক্ষকতার পেশায় আসার পূর্বে সাংবাদিক হিসেবে তিনি এক বর্ণাঢ্য জীবন অতিবাহিত করেন। ১৯৫৮ সালে জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত *দৈনিক মজলুম*-এ কিছুদিন কাজ করেন। পত্রিকাটি অল্প ক'দিন টিকে ছিল।

সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা করার পর শিক্ষানবীশ হিসেবে কিছুদিন *ইত্তেফাক* গ্রুপ থেকে প্রকাশিত *ঢাকা টাইমস*-এ খণ্ডকালীন কাজ করেন। আবদুল গাফফার চৌধুরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক *সোনার বাংলা* পত্রিকা ও দৈনিক *আজাদ*-এও কিছু দিন কাজ করেন তিনি। ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের পত্রিকা দৈনিক *পয়গাম*-এ সিনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে যোগ দেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গঠিত পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্ট ১৯৬৪ সালে *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সেখানে বেছে বেছে উচ্চবেতনে লোক নেয়া হয়। তাঁর কাছেও সেখানে চাকরি করার প্রস্তাব আসে। ৫ জানুয়ারি ১৯৬৫ সালে হাসান হাফিজুর রহমানসহ *দৈনিক পাকিস্তান*-এ যোগ দেন তিনি। সেখানে তিনি সিনিয়র সাব-এডিটর কাম শিফট ইন-চার্জ ছিলেন। স্বাধীনতার আগে-পরে মিলিয়ে প্রায় আট বছর এই পত্রিকায় (পরবর্তী কালে *দৈনিক বাংলা*) চাকরি করেন। এসময় জুনিয়র সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্বও পালন করেন তিনি।

আবুল কালাম শামসুদ্দিন, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, আহসান হাবিব, নির্মল সেন, ফজলুল করিম, ফওজুল করিম, খোন্দকার আলী আশরাফ, তোয়াব খান, মোজাম্মেল হক, আহমেদ হুমায়ুন, সানাউল্লাহ্ নূরী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, মাফরুহা চৌধুরী, ফজল শাহাবুদ্দীন, আফলাতুন প্রমুখ *দৈনিক পাকিস্তান*-এ (এবং পরবর্তী কালে *দৈনিক বাংলা*-য়) তাঁর সহকর্মী ছিলেন।

১৯৭১-এ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা ও নির্যাতনের ওপর তাঁর লেখা দুটি অনুসন্ধনী প্রতিবেদন হাসান হফিজুর রহমান সম্পাদিত *স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস* এর অষ্টম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের এলাকায় চলে যান তিনি। সেখানে গেরিলা যোদ্ধাদের সংগঠক এবং পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন। যুদ্ধের ভেতরও নানা এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য জুতা (কেডস) কিনতে কয়েকবার ঢাকায় আসেন।

স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ প্রায় শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়ে। অধ্যাপক নুরউদ্দিনের অনুরোধে এই বিভাগে শিক্ষকতা করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ১৯৭২ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর তিনি সাংবাদিকতা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৯২ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন।

অধ্যাপক খান ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দয়িত্ব পালন করেন। এসময় তাঁর নেতৃত্বে সাংবাদিকতা বিষয়ে সম্মান কোর্স খোলা হয় এবং সাংবাদিকতার সান্ধ্যকালীন কোর্স উঠে গিয়ে দিবাকালীন কোর্স শুরু হয়। সাখাওয়াত আলী খান এবং তাঁর সহকর্মীরা সম্মান কোর্সের সিলেবাস প্রণয়ন করেন। তখন উপমহাদেশে এটিই ছিলো সাংবাদিকতায় প্রথম অনার্স কোর্স।

তিনি ১৯৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সটিতে ভিজিটিং স্কলার হিসেবে যোগ দেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম প্রেস কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯৮০-

৮২ সালে প্রেস কাউন্সিলের তিন সদস্য বিশিষ্ট জুডিশিয়াল কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৬ সালের পর পাঁচ দফায় তিনি প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) এর ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। সাংবাদিকতা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স প্রণয়নের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন করা অ্যাডহক কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পিআইবিতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় এমএ কোর্স চালুর জন্য গঠিত কমিটির তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন।

তিনি ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের শহীদ আসাদের স্মৃতি রক্ষায় গঠিত আসাদ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই। অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান নরসিংদী জেলার শিবপুরে শহীদ আসাদ কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ (এমএসএস, ৬ষ্ঠ ব্যাচ)

হোসনেয়ারা

ফারুক হোসেন

নাজমুল হাসান

মোঃ মাহমুদুল হাসান

মোঃ জাহিদুর রহমান

সম্পাদক আবদুস সালাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৭'

প্রধান অতিথি: অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক; উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশেষ অতিথি: অধ্যাপক মফিজুর রহমান; চেয়ারপারসন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সভাপ্রধান: অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আজীবন সম্মাননা: শাহেদ কামাল।

স্মারক বক্তা: অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান।

তারিখ: ১৬ জুলাই, ২০১৭।

স্থান: অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আয়োজক: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।